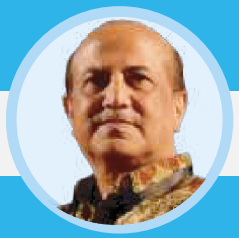

আমার ব্র্যাক জীবন

ল্যানসেটে বাংলাদেশ কথা

আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

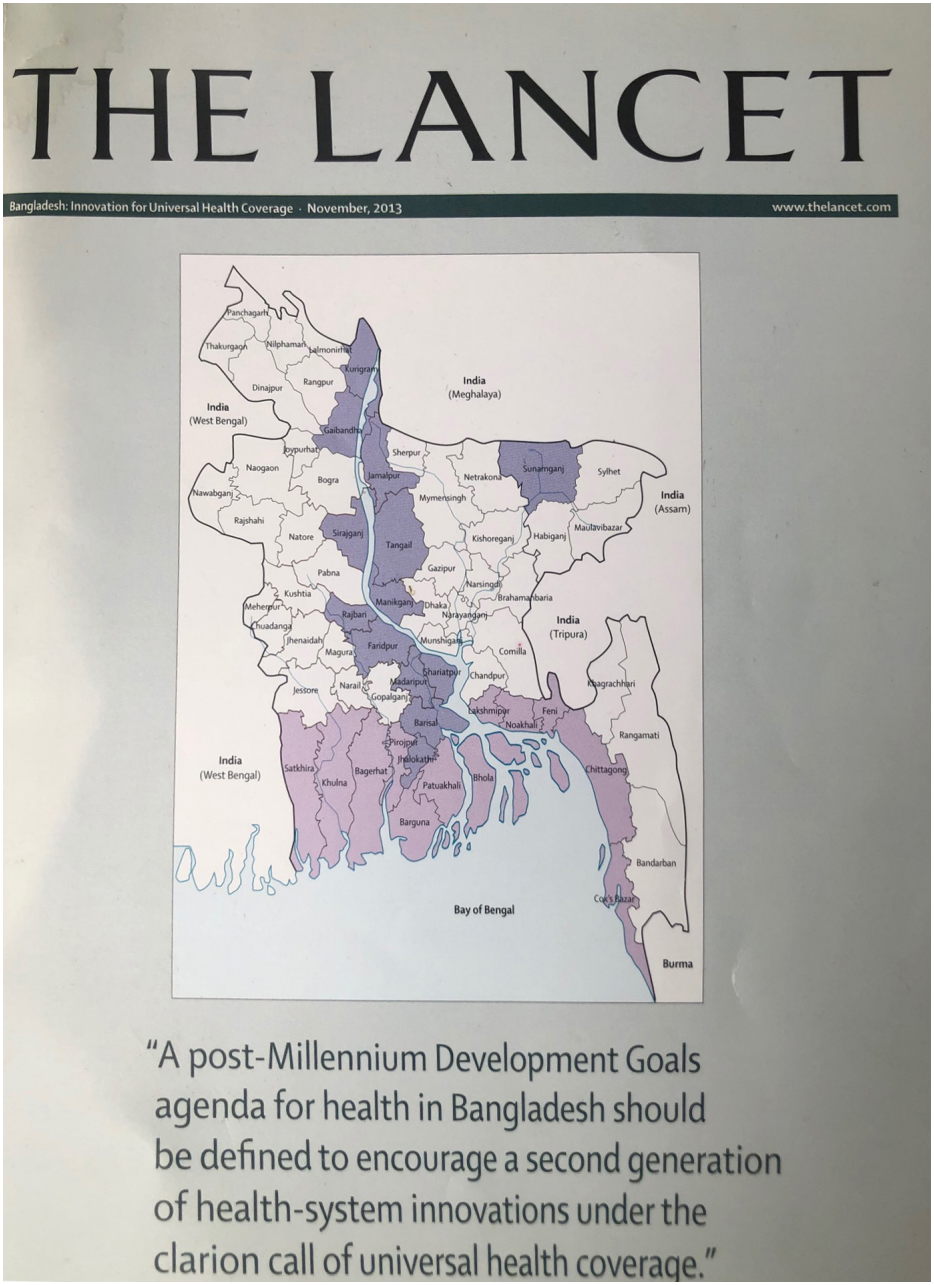

ল্যানসেটে বাংলাদেশ কথা

‘ল্যানসেট’ হচ্ছে চিকিৎসা গবেষণা অঙ্গনে এক মোহনীয় নাম। এটি হচ্ছে পৃথিবীর সেরা এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী এক চিকিৎসা সাময়িকী। ল্যানসেটে কিছু ছাপাতে পারলে গবেষকরা নিজেদের ধন্য মনে করেন। এমনও বলা হয় যে, ল্যানসেটে নাম লেখাতে না পারলে গবেষণা জীবনটাই নাকি ব্যর্থ হয়ে যায়। ডায়রিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ল্যানসেটের সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রথম যে যুগান্তকারী লেখাটি আমার মনে দাগ কেটেছিল তা ছিল খাওয়ার স্যালাইন সম্পর্কিত। লেখক ডেভিড ন্যালিন, রিচার্ড ক্যাশ, রফিকুল ইসলাম ও আব্দুল মজিদ মোল্লা। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে গবেষকরা খাওয়ার স্যালাইনের উপযোগিতার বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে আনেন। সেটি ১৯৬৮ সালের কথা। ল্যানসেটে তা প্রকাশের পর বেশ আলোড়ন তৈরি করে এবং সাময়িকীটির সম্পাদক খাওয়ার স্যালাইনকে শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি দেন। ১৯৮০ সালে সেই লেখা পড়ে মনে মনে ভাবতাম আমিও যদি ল্যানসেটে লিখতে পারতাম! আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল, তবে তা বেশ কয়েক বছর পর। উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৃথিবীর আরও অনেক নামি-দামি সাময়িকীতে আমার লেখা স্থান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন, বিএমজে, সায়েন্স, ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট, বুলেটিন অব দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন, রিভিউ অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রভৃতি। কিন্তু ল্যানসেট-এর ভাবমর্যাদাই অন্যরকম।

ডায়রিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ল্যানসেটের সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রথম যে যুগান্তকারী লেখাটি আমার মনে দাগ কেটেছিল তা ছিল খাওয়ার স্যালাইন সম্পর্কিত।

ল্যানসেট সাময়িকী লন্ডন থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮২৩ সালে। সমাদৃত এই সাময়িকীর বর্তমানে নিয়মিত পাঠক সংখ্যা ১৮ লক্ষ। ল্যানসেটে বিভিন্ন ধরনের লেখা ছাপা হয়। প্রতি সপ্তাহে শত শত লেখা জমা পড়ে কিন্তু তার মধ্য থেকে শতকরা মাত্র পাঁচভাগ প্রকাশিত হয়, বাকি পঁচানব্বই ভাগই প্রত্যাখ্যাত হয়। লেখার মানের ব্যাপারে ল্যানসেটের নিয়মকানন বড়ই কড়া।

আশির দশকের শেষদিকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাক এবং জাপানের কয়েকজন চিকিৎসক যক্ষ্মার চিকিৎসা নিয়ে মানিকগঞ্জে মাঠ গবেষণা শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে ‘ডটস’ (ডাইরেক্টলি অবজারভড ট্রিটমেন্ট)-এর যাত্রা শুরু হয়। এ বিষয়ে অন্যত্র আরও

ছবি: ইন্টারনেট

বিশদভাবে লেখা হয়েছে। যাহোক ব্র্যাকের যক্ষ্মা চিকিৎসার উদ্ভাবনা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মুখপাত্র আমাদের একটি লেখা প্রকাশ করে। সেটা ১৯৯১ সালে কথা। ওই লেখা পড়ে ব্র্যাক সম্পর্কে অনেকের আগ্রহ জাগে। ভাবলাম, এ বিষয়ে ল্যানসেটে একটি 'শর্ট কমিউনিকেশন' পাঠালে কেমন হয়? তাই হলো। ল্যানসেটে সেটাই আমার প্রথম লেখা, প্রকাশকাল ১৯৯২। সে কী উচ্ছ্বাস! সেই ছোট্ট লেখাটিতে যুক্ত হয়েছিলেন সাদিয়া চৌধুরী, আমিনুল আলম এবং জালালউদ্দীন আহমেদ। মনে পড়ে লেখা প্রকাশের পরে অফিসের (গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ বা আরইডি) সকলকে সিঙ্গাড়া দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলাম।

এভাবেই আমার ল্যানসেটের সঙ্গে পরিচয়। এরপর আরও বেশ কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে বিশ্বনন্দিত ওই সাময়িকীতে। ১৯৯৭ সালে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব বা ইনফেকশনের ওপর ব্র্যাক কার্যক্রমের প্রভাব নিয়ে আমরা একটি নিবিড় গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত করি। আমার পিএইচডি'র সুপারভাইজার প্যাট্রিক ভোন প্রাথমিক প্রতিবেদনটি দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তা ল্যানসেটে পাঠানোর জন্য আমাকে বলেছিলেন। বেশ খেটে খুঁটে ল্যানসেটের আঙ্গিকে একটি প্রবন্ধ তৈরি করলাম, যা সহজেই গৃহীত হলো। এই গবেষণায় আমরা তুলে ধরেছিলাম, যেসব উপজেলায় ব্র্যাকের যক্ষ্মা কার্যক্রম চলছিল সেখানে সংক্রমণের হার অন্য উপজেলার চাইতে অর্ধেক। পৃথিবীর খুব কমসংখ্যক গবেষকই এ ধরনের প্রভাব মাপতে পেরেছেন এবং এ কারণেই ল্যানসেট এই কাজের প্রতি ভীষণ আগ্রহ দেখায়। তারও আগে ১৯৯৩ সালে আমাদের আরেকটি লেখা ছাপে ল্যানসেট। উল্লিখিত লেখায় মুখে খাওয়ার স্যালাইন কীভাবে আমাদের সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম। ১১-১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল।

‘ডায়রিয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা কী’? এই প্রশ্নের উত্তরে সত্তরভাগেরও বেশি ছেলেমেয়ে বলেছিল ‘মুখে খাওয়ার স্যালাইন’। মজার বিষয় হলো তাদের মায়েদের যখন খাওয়ার স্যালাইন সম্পর্কে ব্র্যাক ওটেপ-এর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তখন এই ছেলেমেয়েদের অনেকের জন্মই হয় নি। এই গবেষণা থেকে উপসংহার টানা হয় যে, স্যালাইন বানানোর তথ্য এবং দক্ষতা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ইতিহাসে খুব কম স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম এমন সুদূর প্রসারী প্রভাব তৈরি করতে পেরেছে। ওটেপ-এর সর্বস্তরের কর্মীদের আবারও অভিনন্দন জানাই। ১৯৯৯ সালের প্রথমদিকে ল্যানসেট থেকে ডাক এলো। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসকে সামনে রেখে তারা ল্যানসেট-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং আমাকে একটি লেখা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলো। এটি ছিল একটি ‘ইনভাইটেড কন্ট্রিবিউশন’। কাজেই আমার আনন্দিত হওয়ারই কথা।

২০০১ সালের দিকে রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে মানবসম্পদ বা হেলথ হিউমেন রিসোর্স-এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী মানবসম্পদের সমস্যা জানা এবং তার সমাধান চিহ্নিত করা। এর জন্য ছয়টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল, যার একটির প্রতি-আহ্বায়ক ছিলাম আমি। প্রায় দুই বছর কাজ করার পরে বিশাল একটি প্রতিবেদন তৈরি হয় এবং ২০০৫ সালে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ল্যানসেটে ছাপা হয়। এই গবেষণাতে মানবসম্পদের ঘাটতি এবং বিভাজন বিষয়ে বিশদ বিতর্কের অবতারণা করা হয়, যা বিশ্বব্যাপী প্রভাব রেখেছিল। এর ফলশ্রুতিতে Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। বর্তমানে ১৭টি দেশ এই সংস্থার সদস্য। ২০১৭-২০১৯ সাল পর্যন্ত দু’বছর আমি এই সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০৭ সালে ‘বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ’ মানবসম্পদের ওপর একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণাটিও জাতীয়ভাবে বেশ প্রভাব রেখেছিল।

এরপর বেশ কয়েকবার ল্যানসেট-এ লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। একটি লেখার কথা মনে পড়ে। তখন সবেমাত্র রকফেলার ফাউন্ডেশনে যোগ দিয়েছি। আমার অন্যতম দায়িত্ব হলো ‘ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ’ (ইউএইচসি) বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে বিশ্ব

২০০১ সালের দিকে রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে মানবসম্পদ বা হেলথ হিউমেন রিসোর্স-এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী মানবসম্পদের সমস্যা জানা এবং তার সমাধান চিহ্নিত করা।

জুড়ে মতামত সৃষ্টি করা। নিউইয়র্কে আমার জ্যেষ্ঠ সহকর্মী আরিয়েল পাবলোস-এর সঙ্গেই আমার বেশি ওঠাবসা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কীভাবে ইউএইচসি-র প্রবর্তন করা যায়, তা নিয়ে আলোচনায় আমাদের বেশিরভাগ সময় কাটত। এই কাজে সফলকাম হতে হলে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন : জাতিসংঘ, দাতা সংস্থা, পেশাজীবি, একাডেমিক, মিডিয়াসহ সকলের সমর্থন প্রয়োজন। আরিয়েল-এর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম ল্যানসেটে ইউএইচসি-র সমর্থনে একটি মতামত প্রতিবেদন তৈরি করব। প্রয়োজনীয় উপাত্ত নিয়ে একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ তৈরি করলাম। আরিয়েল বলল, আমাদের সঙ্গে যদি একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক পাই তাহলে ভবিষ্যতে তার সমর্থনে ইউএইচসি আন্দোলন জোরদার করা যাবে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর কলাম লেখক লরি গেরেটের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি তো এক কথাতেই রাজি। আমাদের তিনজনের ইউএইচসি সংক্রান্ত এই রচনা প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। ল্যানসেট মানেই বিপুল প্রচার। এরপরে ইউএইচসি'র ওপরে ল্যানসেটসহ অন্য জার্নালে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে কিন্তু আমাদের সেই রচনা একটা বেঞ্চমার্ক হয়ে রয়েছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ইউএইচসি প্রচলন বিষয়ে যুক্তরাজ্যের চেথাম হাউজ নামক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এর নির্বাহী পরিচালক রবার্ট ইয়েটস-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তার সঙ্গে মিলে ইদানীং আমি বেশ কিছু লেখালেখিও করেছি। প্রথম পরিচয়েই রবার্ট আমাকে বলেছিলেন কীভাবে ২০০৯ সালে প্রকাশিত আমাদের সেই রচনা তার মনে দাগ কেটেছিল এবং পরবর্তীতে ইউএইচসি নিয়ে কাজ করতে তাকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। লরি গেরেটের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সপরিবারে তার নিউইয়র্কের বাসায় গিয়েছি এবং পরবর্তিতে সেও ঢাকায় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল।

ল্যানসেট মানেই বিপুল প্রচার। এরপরে ইউএইচসি'র ওপরে ল্যানসেটসহ অন্য জার্নালে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে কিন্তু আমাদের সেই রচনা একটা বেঞ্চমার্ক হয়ে রয়েছে।

আমি রকফেলার ফাউন্ডেশনে যোগদান করি ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে। আমার নতুন কর্মস্থল ব্যাঙ্কক, রকফেলার ফাউন্ডেশনের এশিয়া অফিসে। জীবনের প্রথম কর্মস্থল (ব্র্যাক) থেকে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। কাজেই মন কিছুটা ভারী। কিন্তু ব্যাঙ্কক অফিসের সহকর্মীরা আমাকে যেভাবে গ্রহণ করল তাতে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। অফিসটি ব্র্যাকের

তুলনায় অনেক ছোট। সকালের দিকেই সব সহকর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় পর্ব। সেখানে নিয়ে আসা হলো বিরাট কেক। সন্ধ্যায় আমার জন্মদিনের বিশেষ ডিনার। সব মিলিয়ে আমার ব্যাঙ্কক জীবনের শুরু ছিল খুবই মধুর এবং আন্তরিক। ৮ বছর হলো রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং ব্যাঙ্কক ছেড়ে এসেছি, কিন্তু এখনও সেখানে গেলে আমার জন্য থাকবে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা যা আমি কখনও এড়াতে পারিনি। যাহোক, রকফেলার ফাউন্ডেশনে আমার দায়িত্ব ছিল বেশ প্রসারিত। বৈশ্বিক বিভিন্ন কাজ যেমন ইউএইচসি-র সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছাড়াও আমি ছিলাম ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য বিষয়ে এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত। জানানো হলো, লিঙ্কন চেন-এর সহায়তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য ল্যানসেট একটি সিরিজ বের করবে। রকফেলার ফাউন্ডেশন এতে কিছু অর্থ সহায়তা দেবে, কাজেই আমারও দায়িত্ব এসে গেল। ল্যানসেটের এই উদ্যোগের কথা আমার আগে থেকেই জানা ছিল। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে চায়না মেডিকেল বোর্ডের অর্থানুকূল্যে এ বিষয়ে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এ একটি প্রস্তুতি সভা আয়োজন করা হয়। লিঙ্কন চেন চায়না মেডিকেল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আমিও সেই সভায় ছিলাম। সেখানে দেখলাম কীভাবে ল্যানসেটের কোনো সিরিজ আয়োজিত হয়। আরও দেখলাম এই কাজে কত শ্রম দিতে হয়। লিঙ্কন চেন একজন মাষ্টার আয়োজক। তার কথা এই বইয়ে অনেকবার এসেছে। তিনি আমার এক বিশিষ্ট সুহৃদ এবং মেনটর। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা আসিয়ানভুক্ত নয়টি দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষকরা। আরও ছিলেন পশ্চিমা কয়েকটি দেশ থেকে আগত কিছু বিশেষজ্ঞ। ল্যানসেটের পক্ষ থেকে ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ সহ সম্পাদক বিল সামারস্কিল। হ্যানয়ের সভায় লিঙ্কন চেনের সঞ্চালনায় সিরিজের একটি রূপরেখা দাঁড়িয়েছিল। ব্যাঙ্ককে লিঙ্কন চেনের সঙ্গে দেখা হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সিরিজ সম্পর্কে তিনি আরও অবগত করলেন। বললেন, যেহেতু আমি ব্যাঙ্ককেই থাকব, তাই তার আশা আমি এই কাজে একটু সময় দেব। ঠিক হলো এই সিরিজে অনেকগুলো প্রবন্ধ থাকবে। এর মধ্যে থিমেটিক যেমন : স্বাস্থ্য জনবল, অর্থায়ন, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে। আর থাকবে দেশ-ভিত্তিক কিছু কেসস্টাডি। প্রায় দুই বছর পর অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সিরিজটি ২০১১ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সিরিজের শুরু এবং এর সফল সমাপ্তির মাঝখানে অনেকগুলো ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন পেপারের প্রণেতারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। এরকম একটি সভা হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার জগজাকার্তায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সিরিজের শুরু এবং এর সফল সমাপ্তির মাঝখানে অনেকগুলো ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন পেপারের প্রণেতারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন।

সেই সভায় আমি আব্বাস ভূঁইয়াকেও আমন্ত্রণ জানাই। ব্যাঙ্ককে এই সিরিজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় থেকেই মনে মনে ভাবছিলাম বাংলাদেশের ওপর এমন একটি সিরিজ করলে কেমন হয়। আমাদের দেশের নানা স্বাস্থ্য সূচক উন্নয়নে একটি অতি সুন্দর স্টোরি আছে যা বহির্বিশ্বে তেমন প্রচার হয়নি। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন আমি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে অনেক বক্তৃতা করেছি। শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার ইত্যাদি কীভাবে কমেছে এবং পরিবার পরিকল্পনা, খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহার এবং শিশুদের টিকা দেওয়ার হারের ঊর্ধ্বগতি সভায় যোগদানকারীদের মনে গভীর রেখাপাত করে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল। অথচ এসব অর্জন অনেকের কাছে স্ববিরোধী বা প্যারাডক্স বলেই মনে হচ্ছিল। বাংলাদেশের দরিদ্রতার অবস্থা কে না জানে। তার ওপর ছিল ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। জগজাকার্তার সভায় প্রথমে লিঙ্কন চেন-এর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম। তিনি নিজে বাংলাদেশ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এবং এই স্টোরি তার জানা আছে। তাই সঙ্গেসঙ্গেই সায় দিলেন। তার পরামর্শে ল্যানসেটের বিল সামারস্কিলের কাছে বিষয়টি তুললাম। বিল একজন রাশগম্ভীর মানুষ। মনে হলো আমার এই চিন্তা ভাবনা তার পছন্দ হলো কিন্তু সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' বললেন না। একটি ধারণাপত্র বা কনসেপ্ট নোট তৈরি করতে বললেন, যা নিয়ে তিনি লন্ডনে গিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন। আমরা তো মহাখুশি। জগজাকার্তায় আব্বাস ভূঁইয়া আর আমি সস্ত্রীক গিয়েছিলাম- উদ্দেশ্য কিছুদিন একসঙ্গে ছুটি কাটানো। বালির অপরূপ নিসর্গে আমাদের নিত্য আলোচনার বস্তু ছিল - ল্যানসেট বাংলাদেশ সিরিজ।

যার যার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম। খুব দ্রুত একটি কনসেপ্ট নোট তৈরি করলাম। সেখানে ছিল সম্ভাব্য সিরিজের যৌক্তিকতা, কী ধরনের পেপার হতে পারে তার একটি তালিকা এবং সম্ভাব্য গবেষকদের নাম। এও লিখলাম যে, এর জন্য যে ব্যয় হবে তা রকফেলার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর সেটি পাঠিয়ে দিলাম বিল সামারস্কিলের বরাবরে, কপিতে রাখলাম লিঙ্কন চেনকে। সঙ্গেসঙ্গে রকফেলার ফাউন্ডেশনে আমার সহকর্মীদেরও অবহিত করলাম, যাতে এই উদ্যোগে অর্থ অনুদানে কোনো সমস্যা না হয়। সামারস্কিল কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর দিলেন। বললেন, প্রধান সম্পাদক রিচার্ড হর্টন এই সিরিজে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আরও বললেন যে, ল্যানসেটের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখবেন তার আরেক জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক পামেলা দাস। কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকায় যেতে মনস্থ করলাম। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার জন্য রকফেলার ফাউন্ডেশনে একটি প্রস্তাবও পেশ করা হল, যা খুব দ্রুতই অনুমোদন পেয়ে গেল। পুরো ব্যয় হবে প্রায় পঁচানব্বই হাজার ডলার। ঠিক করলাম যারা এই প্রকল্পে লেখক হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে সম্মানী ছাড়াই কাজ করতে হবে, যাকে অনেকে বলেন 'প্র-বনো'। ঢাকায় পৌঁছে সম্ভাব্য লেখকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করলাম। কারও কারও মতামত ছিল যে, এই সিরিজে শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের মধ্য থেকেই লেখক নির্বাচিত হোক। আব্বাস ভূঁইয়া এবং আমি এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলাম। কারণ বাংলাদেশের উন্নয়নে বিদেশি গবেষকদের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাদের বাদ দিলে আমাদের কাজটা একপেশে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক হয়ে যেতে পারে। আমরা সেটা চাই না। উপরন্তু বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে এই সিরিজ অনেক সমৃদ্ধ হবে।

প্রারম্ভিক পেপার ছিল সিরিজের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ‘পেরাডক্স’ নিয়ে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলো কীভাবে দিন দিন উন্নীত হচ্ছে তার বর্ণনা দেওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

সব মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশজন গবেষক সিরিজের ছয়টি প্রবন্ধে যুক্ত হলেন। প্রারম্ভিক পেপার ছিল সিরিজের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ‘পেরাডক্স’ নিয়ে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলো কীভাবে দিন দিন উন্নীত হচ্ছে তার বর্ণনা দেওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে এবং আব্বাস ভূঁইয়াকে, যারা এই সিরিজের মূল সমন্বয়কারী। দ্বিতীয় পেপারের দায়িত্ব পান সৈয়দ মাসুদ আহমদ এবং টিম ইভান্স। এই পেপারটি ছিল বাংলাদেশের বহুমাত্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর, যেখানে মূলধারা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে অন্য ধারা যেমন : হোমিওপ্যাথিক-আয়ুর্বেদিক-ইউনানি এবং গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা গ্রাম ডাক্তার ও কম্যুনিটি হেলথ ওয়ার্কাররা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে, তা-ও তুলে ধরা। তৃতীয় পেপারটিতে বাংলাদেশে সমাজভিত্তিক নানা কার্যক্রম ও অংশীদারত্বের একটি ফিরিস্তি দেওয়া হয়। এর প্রধান প্রণেতা বা গবেষক ছিলেন শামস আরেফিন ও সহযোগীরা। চতুর্থ পেপারের দায়িত্বে ছিলেন এলেনা অ্যাডামস এবং তার সহকর্মীরা। তারা বাংলাদেশে বৈষম্য দূরীকরণে সাফল্য এবং এর বিভিন্ন চালিকাশক্তিগুলোকে চিহ্নিত করেন। পঞ্চম পেপারের দায়িত্বে ছিলেন রিচার্ড ক্যাশ ও তার সহকর্মীরা। এই পেপারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে বাংলাদেশকে আগে কাবু করত এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে কীভাবে এর প্রভাব অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এসেছে, সেই বিষয়ের অবতারণা করা হয়। শেষ পেপার ছিল ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ নিয়ে এবং কেন ও কীভাবে বাংলাদেশ এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে তার একটি বিষদ আলোচনা এবং সুপারিশ সেই লেখায় স্থান পায়। এই পেপারের দায়িত্বে ছিলেন এলেনা অ্যাডামস। মূল লেখক কারা হবেন তা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান এবং বহুল পরিচিত আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে ইতোপূর্বে লেখার অভিজ্ঞতা মূলত আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এ ব্যাপারে ল্যানসেটের পামেলা দাস এবং লিঙ্কন চেনের সঙ্গেও আলোচনা হয় এবং তাদের সম্মতি নেওয়া হয়। প্রতিটি প্রবন্ধে একাধিক লেখক অংশগ্রহণ করেন। লেখক নির্বাচিত হয়ে গেলে তাদের সকলকে স্বীয় প্রবন্ধের বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করতে বলা হয়। রূপরেখাগুলো নিয়ে

ছবি: ইন্টারনেট

ব্যাঙ্ককে একটি কর্মশালায় উপস্থাপিত হয়। চুলচেরা বিশ্লেষণের পর লেখকদের তাদের প্রবন্ধ লেখার আহবান জানানো হয়। ল্যানসেট-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজে তাদের মনোনয়ন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। এভাবেই মূল কাজ শুরু হয়। যারা মূল লেখক তারা সকলেই নামকরা ব্যক্তিত্ব এবং প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ। তাদের কাছ থেকে সময়মতো খসড়া পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সিরিজের অভিজ্ঞতার আলোকেই এই সন্দেহ। বাংলাদেশের বেলায়ও কমবেশি তাই হলো। ডেডলাইন কয়েকবারই বদলাতে হয়েছিল। প্রথম খসড়া এসে গেলে তা রিভিউ করা এক দুরূহ ও বিরক্তিকর প্রক্রিয়া। বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ইংরেজি ভাষার সঠিক প্রয়োগসহ অনেক বিষয়ই এই রিভিউতে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধগুলো আব্বাস ভূঁইয়া এবং আমি প্রথমে রিভিউ করে লেখকদের কাছে পাঠাতাম। এই রিভিউয়ের ওপর লেখকরা আরও কাজ করতেন। কাজ শেষে পাঠালে তা আমরা লিঙ্কন চেনকে পাঠিয়ে দিতাম। বলে রাখি, লিঙ্কন চেন একজন অতি সতর্ক রিভিউকারী এবং এডিটর। তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে আমাদের মতানৈক্যও হতো। তার দেওয়া কমেন্টের ভিত্তিতে লেখকরা পুনর্বার সংশোধন করতেন। সংশোধনের পরে লেখকরা তা আলাদাভাবে ল্যানসেটে সাবমিট করতেন। সেটাই হলো আনুষ্ঠানিক সাবমিশন। ল্যানসেট এরপর তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়া শুরু করত। প্রতিটি পেপারই নূন্যপক্ষে দু'জন নিরপেক্ষ সমালোচক বা রিভিউকারের কাছে পাঠানো হতো। আরেকবার সংশোধনের জন্য তাদের কমেন্টগুলো লেখকদের জানানো হতো। নতুন খসড়া ল্যানসেট সম্পাদকের মনঃপুত হলে তবেই তা সাময়িকীতে ছাপানোর জন্য তৈরি বলে বিবেচিত হতো। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতে মোট দু'বছরের মতো সময় লেগেছিল।

সবগুলো প্রবন্ধ পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে ল্যানসেট সম্পাদকের যোগাযোগ বেড়ে যায়। যে কোনো সিরিজে মূল প্রবন্ধ ছাড়াও আরও কিছু কিছু লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলোকে বলা হয় 'কমেন্টারি'। সাধারণতঃ সিরিজ প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশদ জ্ঞানের অধিকারী আন্তর্জাতিক কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে এই কমেন্টারি লেখার জন্য আহবান জানানো হয়। স্যার ফজলে হাসান আবেদ লেখেন একটি কমেন্টারি। ঠিক করা হয় যে অমর্ত্য সেনকে অনুরোধ জানানো হবে। তার সঙ্গে যোগাযোগের

জন্য লিঙ্কন চেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি জানালেন যে, অমর্ত্য সেনের সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ঠিক করলাম আমি নিজেই তাকে লিখব। তাই হলো। চিঠির সঙ্গে ছয়টি প্রবন্ধের খসড়াও পাঠিয়ে দিলাম। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার ইতিবাচক উত্তর পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম। বলা বাহুল্য, স্যার আবেদ এবং অমর্ত্য সেনের কমেন্টারি পুরো সিরিজকে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, স্যার আবেদ এবং অমর্ত্য সেনের কমেন্টারি পুরো সিরিজকে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

সিরিজের শেষ প্রবন্ধ ছিল অনেকটা উপসংহার এবং সুপারিশ পর্যায়ের। ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ কীভাবে বাংলাদেশে প্রচলন করা যায় তার সমর্থনে একটি ‘কল টু অ্যাকশন’ ছিল, যাতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা স্বাক্ষর করেন। যাদের কাছেই আমরা গেছি তারা প্রায় সবাই একবাক্যে সম্মতি দিয়েছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক এনজিও ব্যক্তিত্ব ছিলেন ব্যতিক্রম। তার অবগতির জন্য সবগুলো প্রবন্ধের কপি এবং স্যার আবেদ ও অমর্ত্য সেনের লেখাগুলো দিলাম। বোঝা গেল তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে সবগুলো পড়েছেন। তার নেতিবাচক অবস্থানের কারণও বুঝতে পারলাম। টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলে একদিন সকালে তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। আব্বাস ভূঁইয়ারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে ছিটকে পড়ল। আমাকে তিনি অনেক স্নেহ করেন। তার অনুযোগ তার নিজস্ব এনজিও সম্পর্কে আমরা তেমন গুরুত্ব দিয়ে লিখিনি। আমি বললাম, সেটা ঠিক। তবে ল্যানসেটে কিছু লিখতে হলে তার পেছনে শক্ত যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন পড়ে। যদিও আমরা ব্যক্তিগতভাবে তার সংস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করি, কিন্তু সঠিক প্রমাণাদির অভাবে আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারিনি। তিনি বললেন, তোমরা তাহলে নতুন একটি গবেষণা করে আমাদের কাজের প্রভাব সম্পর্কে জেনে নাও। বললাম, সিরিজের কোনো অংশেই প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। শুধুমাত্র প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই তা তৈরি করা হয়েছে, সেজন্য নতুন উপাত্ত সংগ্রহের কোনো অবকাশ নেই। অধিকন্তু এই সিরিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। তখন তিনি কিছুটা অবুঝের মতো

ছবি: ইন্টারনেট

বললেন, উদ্বোধনটি আপাততঃ স্থগিত করে দাও। ভাবলাম, এর পরে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাকে বিনীত সালাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম। ল্যানসেট সিরিজ তার সম্পৃক্ততা থেকে বঞ্চিত হলো। এই ঘটনা আমাকে এখনও পীড়া দেয়।

মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এলো। ১৯শে নভেম্বর ২০১৩। সিরিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। আগের দিন রিচার্ড হর্টন এবং পামেলা দাস ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ। সভাপতি স্যার ফজলে হাসান আবেদ। এক গুরুগম্ভীর পরিবেশে ল্যানসেট বাংলাদেশ সিরিজের উন্মোচন হলো। মূল বক্তৃতায় রিচার্ড হর্টন বাংলাদেশের অর্জনের অনেক প্রশংসা করলেন এবং সঙ্গেসঙ্গে পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলোকে একইভাবে মোকাবিলা করার আহবান জানালেন। তার মতে বাংলাদেশের এই অর্জন অনেকের জন্য অনুকরণীয়, যাকে তিনি বলেছেন 'a great mystery of global health'। এই সিরিজের পেছনে আমরা যারা কাজ করেছি, তাদেরকে সাধুবাদ জানালেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে রিচার্ড হর্টনসহ কয়েকজন প্রবন্ধ লেখক উপস্থিত থেকে নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক শিশির মোড়লকে দিয়ে ভোরবেলায় হর্টনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। হর্টন একজন সুবক্তা। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি ল্যানসেটের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার এবং পামেলা দাসের আমন্ত্রণে ২০১৪ সালে আমি লন্ডনে ল্যানসেট-এর প্রধান কার্যালয় সফর করেছিলাম।

ল্যানসেট সিরিজের কাজ যখন শেষের দিকে তখন একটা ইমেল পেলাম। প্রেরক জন লেন, ল্যানসেটের খণ্ডকালীন কলাম লেখক। তার বার্তাটি পেয়ে আমি তো প্রায় বাকরুদ্ধ। জানালেন যে, ল্যানসেট কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছেন যে তারা তাদের সাময়িকীতে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আমার প্রোফাইল প্রকাশ করবেন।

বাংলাদেশ থেকে এর আগে মাত্র একজন এই বিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি হলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বারডেম-এর প্রধান এ কে আজাদ খান। জন লেন পরবর্তীতে আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রোফাইল লিখেছিলেন। সেখানে আমার ছবিও স্থান পেয়েছিল। আবেদ ভাইয়ের মৃত্যুর পর ল্যানসেট তাঁর ওপর একটি দীর্ঘ 'অবিচুয়ারি নোট' ছেপেছিল।

সিরিজের প্রতিটি লেখাই জ্ঞানের জগতকে করেছে সমৃদ্ধ। সেগুলো বেশ সমাদৃতও হয়েছে। এখনও এই প্রবন্ধগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হচ্ছে।

২০১৩ সালের নভেম্বরের সেই দিনটির কথা এখনও মনে পড়ে। মানবজীবনে কোনো একটি ক্ষণ আসে যখন কেউ পরিপূর্ণতা অনুভব করে। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য ওই দিনটি ছিল সেই ক্ষণ। এই সিরিজের পেছনে অনেক সময়, শ্রম ও মেধা দিতে হয়েছিল। অনেক চড়াই উৎরাই পার করে বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বকে আমরা এই সিরিজটি উপহার দিতে পেরেছিলাম। সিরিজের প্রতিটি লেখাই জ্ঞানের জগতকে করেছে সমৃদ্ধ। সেগুলো বেশ সমাদৃতও হয়েছে। এখনও এই প্রবন্ধগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হচ্ছে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা দেয়। যার ফলে বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি দারুণভাবে অবদমিত হয়। আব্বাস ভূঁইয়া এবং আমি ঠিক করলাম যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে গিয়ে ল্যানসেটে বর্ণিত বাংলাদেশের সব ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরব। বাংলাদেশের বন্ধুদের সহায়তায় দিল্লী, ইসলামাবাদ, ব্রাইটন, লন্ডন, ব্রাসেলস, ওসলো, স্টকহোম, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্থানে আমরা সেই কাজটি করতে পেরেছিলাম। সেটা ছিলো দেশের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। ল্যানসেটকে ধন্যবাদ।

আমার ব্র্যাক জীবন